।। উপসংহার ।।

আমরা একটি বিশেষ কাল-পরিধির মধ্যে বিধৃত বাংলা ট্র্যাজেডি নাটকের বিচার বিশ্লেষণ শেষ করেছি। রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি ট্র্যাজিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও নাটকটিকে ট্র্যাজেডি বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, এই নাটকে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সে-দুঃখের অন্ত আছে শেষপর্যন্ত বেদনার পথ ধরে বেদনার উত্তরণ ঘটে যায়, তার সান্ত্বনা মেলে। লক্ষ করি আঘাতে আঘাতে, বেদনায় বেদনায় মানুষটি বদলে গেল, সত্যকে মেনে নিল, বলা সঙ্গত সত্যকে ভালবাসল। একই জন্মে ঘটে গেল জন্মান্তর। ফলে সর্বস্ব খোয়াবার মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর অনুভূত হয় না। গ্রীক বা শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এমন কথা ভাবাই যাবে না। সেখানে ঘটনার নাভিকুণ্ডে দুঃখ, পরিণামেও তা অন্তহীন। আলো আসবার এতটুকু ফাঁক নেই - বরঞ্চ লক্ষ করি মানুষের জীবনের মর্মমূলে প্রতিকারহীন দুঃখযন্ত্রণা বাসা বেঁধে আছে। একদিকে দুঃখযন্ত্রণাভোগের নিদারুণতা আমাদের যেমন আতঙ্কিত করে তেমনি অপরদিকে ঐ যন্ত্রণাভোগের ভিতর দিয়ে ভোক্তার অসীম হৃদয়বল ও শৌর্য ব্যক্তিত হয়ে আত্মগৌরবে উদ্দীপ্ত করে। [১]

"মুক্তধারা" নাটকে লক্ষ করি উগ্র জাতীয়তাবাদ জীবনে কি ভয়ানক বিভীষিকা ডেকে আনে। এই নাটকের পটভূমিকায় রয়েছে যুদ্ধোত্তর য়ুরোপ এবং তার অন্ধ জাতীয়তাবাদ আর তার সহায়ক বিজ্ঞানশক্তি - ফলিত বিজ্ঞান। উত্তরকূটাধিপতি রাজা রণজিৎ ফলিত বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে অন্ধজাতিবিদ্বেষে শিবতরাই এর তৃষ্ণার জল বন্ধ করেছেন। তাঁর লোভ আলের আঁচড় টেনে গভীর ক্ষতরেখা এঁকে দেয় দিগন্ত ছোঁয়া ধানের ক্ষেতের বুকে, বাঁধ দেয় নদীর জলে। ফলে একদিকে ভোগের প্রাচুর্য অপরদিকে অনাহার, উপবাস। জলের অভাবে ক্ষেতগুলো শুকিয়ে মরে, ফসল ফলে না, অথচ খাজনা মকুব হয় না। মুক্তধারার বাঁধ তুলতে কত প্রাণ বলি হল, কত অসহায় পুত্রশোকে পথে পথে কেঁদে ফেরে, শিবতরাই এর মানুষের কান্না মুক্তধারার জলের কল্লোলে মিশে যায়, অনাহারে, অনিদ্রায় জরাজীর্ণ মানুষগুলো লুটিয়ে পড়ে বোবা মাটির বুকে। কিন্তু তাতে

রাজার মন টলে না, - এতটুকু বিচলিত হয় না তাঁর বেতনভুক বিভূতি। শিবতরাই এর দুঃখযন্ত্রণা উত্তরকূটের আনন্দোৎসবের হেতু।

কিন্তু এরই মধ্যে ভিতরে ভিতরে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। আছেন অভিজিৎ, আছেন বিশ্বজিৎ আর আছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। অভিজিৎ রাজার পালিত পুত্র। তাঁর প্রতি রাজার রয়েছে গভীর স্নেহ। বাঁধের মধ্যে যেমন ছিল ছিদ্র তেমনি কঠিন রাজার ভিতরে ছিল দুর্বল ত্রুটি জায়গা। জাতিবিদ্বেষের অন্ধতায়, ফলিত বিজ্ঞানের সাফল্যের নেশায় রাজা কোনো দিন তাকে আমল দেন নি। অভিজিতের মনকে বোঝাবার চেষ্টাই করেন নি। কিন্তু এর ফল হল মারাত্মক। ঘটনাচক্রে দেখি অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিয়েছেন। যন্ত্রদানব ফিরে তাঁকে আঘাত করেছে সঞ্জয়ের উক্তি থেকে জানতে পারি, - "ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।" প্রকৃতপক্ষে এই আঘাত এসে বাজল রাজা রণজিতের বুকে। তিনি তখন নির্বাক। তবুও অভিজিতের আত্মদান এমন গৌরবের যে, যা ট্র্যাজিক আবেদন সৃষ্টি করে না, এমন এক ভাবজগতের মুখোমুখি করে দেয়, যা মৃত্যুর বেদনা, ক্ষয়ক্ষতির রিক্ততাকে ছাপিয়ে প্রাণের জয়যাত্রাকে ঘোষণা করে। এতে হারানোর বেদনা আছে, গৌরবও আছে। বেদনা ঐ গৌরবকে পরিপুষ্ট করে। রাজা তাঁর কৃতকর্মের ফলে প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁর ব্যথা বেদনা কিছু কম নয়, তথাপি অনুমান করি ঐ যন্ত্রণা নতুন সৃষ্টির প্রাকমুহূর্ত। "বিসর্জন" নাটকে রঘুপতির জন্মান্তরের কথা স্পষ্ট করে বলেছেন আর এই নাটকে তা ইঙ্গিতের মধ্যে নিহিত। সেই ইঙ্গিত নিহিত নাট্যকাহিনীর সংবেদনার মধ্যে। ড. ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন, - "বিপ্লবাত্মক আত্মত্যাগের দ্বারা মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে মৃত্যুবরণের মধ্যে মুক্তির দিকটি সমধিক প্রকটিত হয়েছে।" [২]

আসলে যে অনুভব কবি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত করেছেন তা হল এই যে, প্রথার নামে হক, জাতীয়তাবাদের নামে হক মানুষ যখন নিজের সৃষ্টিকে জীবনের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে বসে, তাকে করতে চায় শাশ্বত অথচ গতিহীন তখন আপন আবেগে তা ভেঙে পড়ে। প্রাণের মূল্যে প্রাণের গতি থাকে অব্যাহত ॥ ধর্মের নামে, দর্শনের নামে,

অস্ত্রের জোরে, রাজনীতির শ্লোগান দিয়ে প্রাণের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না কখনো । "মুক্তধারা" নাটকে দেখি অন্ধ প্রতিবিদ্বেষ, দম্ভ মানুষের অকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের জীবনে কী নিদারুণ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে । লক্ষ করেছি লোভের উত্তেজনা, শক্তির দম্ভ প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে কি ভাবে নররক্তের আহুতি দিচ্ছে, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত মিথ্যাচারে, কপটতায় নরঘাতী নিষ্ঠুরতায় নির্লজ্জভাবে কলুষিত । একপক্ষের মানুষ কঠিন শোষণে আর নিষ্ঠুর শাসনে জীবন্মৃত হয়ে আছে । কিন্তু এর পাশাপাশি লক্ষ করি ; বলা সঙ্গত এই অনুভবে উদ্দীপিত হই যে, প্রতিকারহীন নয় এই পরাভব । অভিজিতের দুঃখবরণ, আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবার নয় । ঐ দুঃখ সৃষ্টি ও ভোগের মূলে আছে জ্ঞানের অভাব, বুদ্ধির দৈন্য, অনুভূতির অসাড়তা । অনুমান করি মানুষের দুঃখভোগের বাস্তবচিত্র এঁকে, তার হেতু নির্দেশ করে কবি বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সবই মানুষের মুখ তাকিয়ে, মানুষ আগে আর সব পরে । মানুষের স্বভাবের মধ্যে বন্ধন-সৃষ্টির যে দুঃখজনক সম্ভাবনা রয়েছে তৎসম্পর্কে সচেতন থেকে, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পরিধিকে দেশে ও কালে বিস্তৃত করলে, মানুষকে স্বার্থসাধনের বিষয় হিসেবে না দেখলে এহেন বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি । মানুষের জীবনের উপর ভর করে আছে যে পৈশাচিক লালসা তাকে বিসর্জন দিতে পারলে অমন দুর্ভোগ এড়ানো যাবে । জাতীয়তার নামে কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার উদ্বোধন অপরের সম্পর্কে ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টি যার লক্ষ এবং ভিত্তি, যা মানুষের আত্মিক শক্তিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে মুক্তির পথকে আড়াল করে দাঁড়ায় তাকে সবলে উপেক্ষা করতে পারলে অমন জ্বালার হাত থেকে মুক্তি অবধারিত । রজেই এই নাটকে যন্ত্রণাভোগের ছবি দেখেছি, তার লৌকিক হেতু জেনেছি সর্বোপরি যন্ত্রণামুক্তির ইশারা যেন পাওয়া যায় ।

"মুক্তধারা" নাটকের নায়ক রাজা রণজিৎ সেক্সপীরীয় নায়কের মতো বলিষ্ঠ, আপসহীন, ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছবার জন্যে একরোখা। ফলে তাঁর চরিত্রের ভারসাম্য বিচলিত, নিজের কৃতকর্মের জন্যে হারিয়েছেন অভিজিৎকে । তবুও নাটকের সামগ্রিক সংবেদনা ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে না । কারণ এই যে নাটকের কথাবস্তুর আবেদন রণজিতের বেদনাকে ছাপিয়ে যায় । প্রিয়জনকে হারাবার ব্যথাবেদনা হাহাকার শান্ত ব্যথাতুর গৌরবের মধ্যে শেষ হয়ে

যায়। রাজা রণজিৎ অনুতপ্ত, অনুমান করি অনুতাপের ভিতর থেকে জন্ম নেবে নতুন মানুষ যিনি আর কোনোদিন মুক্তধারাকে বাঁধ দিতে চাইবেন না। আমরা আরো লক্ষ করি এই নাটকের ভিত্তি হল রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, ব্যক্তিকে অবলম্বন করে তার প্রকাশ ঘটেছে।[৩] আর এই জাতীয় সমস্যা যেখানে বিড়ম্বনার হেতু সেখানে তা সাময়িক - এই বিপর্যয় অন্তহীন নয় - নয় প্রতিকারহীন।[৪] এহেন নাটক নাটক গম্ভীর কিন্তু ট্র্যাজিক নয়। আমাদের মনে হয় সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি ভাবনার প্রান্তদেশে কবি এমন একটা সূক্ষ্ম পাড় বুনে দিলেন যার জন্যে সর্বস্ব খোয়াবার বেদনা মর্মভেদী হয়ে ওঠে না। এবং এটা যুগোচিত।

॥ ২ ॥

আমরা এর আগে আলোচনা করে দেখেছি যে রোমান্টিকেরা মানুষের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন দুঃখজ্বালার ভিতর দিয়ে মানুষের ভাবগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে, জৈব মানুষ হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক।

আধুনিক কালের অন্যতম মতবাদ মার্কসবাদ। মার্কসবাদীরাও মানুষের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবে বিশ্বাস করেন না - বিশ্বাস করেন না মানুষের দুঃখভোগের মূলে অব্যাখ্যেয় কোনো অতিলৌকিক কারণ আছে, দৈবের নিগূঢ় অট্টহাসি রয়েছে। দুঃখযন্ত্রণাভোগের হেতু যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধির আওতায় ধরা দিচ্ছে না ততক্ষণ তার লৌকিক ব্যাখ্যা মেলে না এবং তার প্রতিকারের কোনো পথ মেলে না। মার্কসবাদীরা বলেন মানুষের জীবনের বিড়ম্বনার মূল নিহিত ধনবন্টন বৈষম্যের মধ্যে। উৎপাদন পদ্ধতি এবং সামাজিক প্রয়োজনের সংঘাত অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করছে আর ঐ অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর গড়ে উঠছে সমাজ। এহেন সমাজব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে দুঃখের উৎস। কারণ এই সমাজব্যবস্থায় এক ক্ষুদ্রগোষ্ঠী স্ফীত হয়ে উঠছে বৃহত্তম জনসাধারণকে শোষণ করে। ঐ শোষণনীতি যাকে ইংরেজীতে বলে exploitation বর্তমান সভ্যতা তার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। অসংযত ধনলিপ্সা, বিজ্ঞানশক্তির সহায়ে অপরিমিত অপরিমিত ধনসঞ্চয়

যথেচ্ছ ভোগ একদিকে আর অপরদিকে শোষিত মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে পড়ে আছে, ভোগ করছে দুঃখকষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা। বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত-অশক্তের ভেদ আজ বড়ো সাংঘাতিক। আর যেহেতু ঐ ভেদের মধ্যে নিহিত মানুষের দুঃখভোগের হেতু তাই ঐ ভেদ লুপ্ত করতে পারলে মানবজীবনের দুর্ভোগ দূর হবে। তাই যদি মেনে নিই তা হলে এই সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে তথা সমাজবিপ্লব অনিবার্য।[৫] তারজন্যে দুঃখবরণ, মৃত্যুবরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। মার্কসবাদী সাহিত্যিকের লক্ষ দুঃখ ও পাপের বাস্তব হেতু নির্দেশ এবং তার বিরুদ্ধে পাঠকের সংক্রোধ উদ্দীপনের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের প্রত্যুদ্গমন। মার্কসবাদীরা ভবিষ্যতের শোষণহীন শ্রেণীহীন ও সুখী সমাজের স্বপ্নে উদ্দীপিত হয়ে দলে দলে যখন দুঃখবরণ করেন, মৃত্যুবরণ করেন তখন আর তা ট্র্যাজিক হতে পারে না। তাঁরা বিশ্বাস করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিতর দিয়ে সমাজ সভ্যতা এগিয়ে চলেছে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সাম্যবাদি সমাজ জন্মগ্রহণ করবে, পৃথিবীতে নেমে আসবে স্বর্গরাজ্য যেখানে থাকবে না সুবিধাভোগী বিশেষ কোনো শ্রেণী, থাকবে না অবিচার, অত্যাচার। ইতিহাসের গতিকে ত্বরান্বিত করবার জন্যই তাঁদের যাবতীয় প্রয়াস। এহেন আদর্শ স্বপ্নের কাজল চোখে পরে প্রস্তাবিত সুখী সমাজের প্রত্যুদ্গমনের জন্যে আত্মাহুতি, চূড়ান্ত জয় অনিবার্য এই জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে দুঃখবরণ ট্র্যাজেডির পরিপন্থী।[৬]

এছাড়াও কথা আছে। যেসমস্ত হেলেনীয় ও খ্রীস্টীয় মূল্যবোধগুলো ট্র্যাজেডি নাটকে প্রতিভাসিত হয়েছে এতকাল ধরে, যা দুহাজার বছর ধরে য়ুরোপের জীবনবোধকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে এসেছে গত দুটো মহাযুদ্ধের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার আঘাতে সেগুলো জীবন থেকে খসে পড়ল। লক্ষলক্ষ মানুষের মৃত্যু, বোমা ফেলে কয়েক লাখ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, বিষাক্ত গ্যাসকক্ষে কয়ে লক্ষ ইহুদিকে পাইকারী হারে হত্যা আমাদের সংবেদনশীলতাকে বড়ো রূঢ়ভাবে আঘাত করল। মনে হয় প্রতিদিনকার নিষ্ঠুরতার বাস্তব-নৈকট্যের ফলে সুকুমার বৃত্তিগুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল। আজকের রাজনৈতিক অমানবিকতার পক্ষে, তার অপকর্মের সাফাই গাইবার পক্ষে ভাষাকে ব্যবহার করা হল। তার ফলে ভাষার ব্যঞ্জনা গেছে বদলে। অসংখ্য ক্রোধী শব্দের, মর্মান্তিক শব্দের সমাবেশ আর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

ট্র্যাজেডির সমুন্নত ভাষা আপন মহিমা হারালো । আজকের সংবাদপত্রে, বেতারভাষণে, দূরদর্শন প্রতিদিন আমরা যে নির্মমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি, শ্রুতি এবং দর্শনেন্দ্রিয় যেভাবে সর্তাবদ্ধ (conditioned) হয়ে পড়ছে যার ফলে কবি-কল্পিত কোনো মর্মান্তিক কাহিনি আমাদের নাড়া দেয় না । প্রত্যক্ষ বাস্তবের অতিচাপে কল্পনাশক্তি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে । প্রত্যক্ষদৃষ্ট চোখ উপড়ানো এবং ইডিপাসের চোখ উপড়ে ফেলার অথবা "কিং লীয়র" নাটকের গ্লচেস্টারের চোখ উপড়ে ফেলবার মধ্যে সংবেদনার কত তফাত ঘটে গেছে । যা কৃচিৎ ঘটত আজ তা প্রতিদিন ঘটছে বলে সংবেদনার এমন প্রভেদ হয়ে গেছে বলে মনে হয় । এইজন্য আজকের কবি-কল্পিত মর্মান্তিক কাহিনী জোলো ঠেকে । সম্ভবত এখনকার শিল্পীরা এই বিষয়ে সজাগ তাই ট্র্যাজেডি রচনার প্রবণতা কমে গেছে বা যাচ্ছে ।

পক্ষান্তরে লক্ষ করি আধুনিক রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত যে কলুষতায় ভরে গেছে শিল্পীরা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না বলেই তাঁরা কখনো ক্রোধোদীপ্ত কখনো বা হতাশ্বাস, বিষণ্ণ । কলম ছেড়ে তাঁকে হাতিয়ার নিতে হয় । তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় ফেটে পড়তে চান, আবার কখনো বা জীবনবোধের সার্বিক অর্থহীনতায় গতায়ু মূল্যবোধকে ধিক্কার দেন । আজকের শিল্পী, অমঙ্গল, অকল্যাণ সম্পর্কে অতিসচেতন । তার আগ্রাসী প্রভাবে ভারসাম্য বিচলিত । ট্র্যাজেডিকারও অমঙ্গলের দিকে পিঠ দিয়ে থাকেন না ঠিকই, তথাপি বিশ্ববিধানের প্রতি তাঁদের আস্থা ট্র্যাজেডির নান্দনিক বিন্যাসের দ্বারা ছিল সুরক্ষিত । কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণাম সত্ত্বেও জগৎ ও জীবনের সুস্থতা সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন না । আসলে নানা কারণে এই জায়গাটা চিড় খেয়েছে । অথচ ট্র্যাজেডি নাট্যকারের পক্ষে জানা দরকার মঙ্গল-অমঙ্গল একই বস্তুর দুটি মুখ । পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং মানুষের কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী অমঙ্গল প্রবল হয়ে তাকে গ্রাস করে, দুয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায় না । সঙ্গে লক্ষ করি মানুষের হৃদ্‌বৃত্তি যা তৈরী করেছিল মানুষকে একটি বিশেষ ছাঁদে, ছাঁচে, যা মানুষকে শক্তি দিয়েছিল নিজেকে অতিক্রম করবার তা আজ যেন এক গোলোক ধাঁধায় পথ হারিয়ে অনাবৃষ্টির অভিশাপে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে । ট্র্যাজেডি রচনার পক্ষে এইটে হল মারাত্মক বাধা ।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজকের পৃথিবীকে করেছে ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ঘটনা, ভাবনা, চিন্তার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিদ্যুৎগতিতে আর এক প্রান্তে প্রতিফলিত হয়। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হল না। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ধাক্কা এসে লাগেনি ঠিকই, কিন্তু তার ভয়াবহ পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ার হাত এড়ানো গেল না। কালোবাজারী, ফাটকাবাজী, মানুষের তৈরী করা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ভীষণভাবে আহত করল পুরনো মূল্যবোধগুলোকে। তারপর দেশভাগ করে আমরা পেলাম স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে এল সাম্প্রদায়িক হানাহানি, উদ্বাস্তু সমস্যা। ধীরে ধীরে এল ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে ঐ সমস্যাগুলো পুঞ্জীভূত হতে হতে হিমালয়ের দুর্বহভার নিয়ে চেপে বসল ঘাড়ে। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। তদুপরি রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙাগড়া, নেতাদের ছলচাতুরী, অনুগামী যুবকদের খুনে রাজনীতিতে নিয়োগ, মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা সব মিলেমিশে এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করল যার আঘাতে আঘাতে পুরাতন মূল্যবোধ তথা মানবিক মূল্যবোধ যাকে ইংরেজীতে বলে 'human values' অবক্ষয়িত, অবসিত।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৭ এর পর থেকে তার মধ্যে বিদ্যুৎগতি সঞ্চারিত হল। কল্লোলের যুগে লক্ষ করি বাঙালী মানস উত্তেজিত, উদ্ভ্রান্ত - বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নৈরাশ্য, ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা। তারপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে চরম তিক্ততা। সমাজ ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি টলে গেল। জাতি পুঞ্জীভূত গ্লানিতে পঙ্কস্নান করে উঠেছে। মার্কসবাদও এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। মার্কসবাদ মুক্তির নামে আরেক আবদ্ধতা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে মার্কসবাদীরা প্রমিথিউস বলে দাবি করলেও কার্যতঃ ভালকান্ দেবতার মতো স্নায়ুকর্ম ও চিন্তার দাসত্ব করতে গিয়ে নিজসৃষ্ট জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছেন। তাছাড়া আগেই বলেছি মার্কসবাদ স্বভাবধর্মে ট্র্যাজেডির পরিপন্থী। সে যাই হক এহেন অবস্থায় বিশ্ববিধানের উপর আস্থা টলে গেল। লেখকদের জীবনবোধ যাকে বলে sense of life বদলে গেল। জীবনবোধ এক সার্বিক অর্থহীনতার মধ্যে মাথা কুটতে থাকল। পুরাতন মূল্যবোধের বিকল্প কিছু থাকল না। এক অসমৃদ্ধ,

হৃদয়হীন জগতের মুখোমুখি হয়ে বিষণ্ণ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?
একথা সকলেই মানবেন যে জীবন ও জগতের অর্থ তাৎপর্য খোঁজা ট্র্যাজেডির অন্যতম দিক অন্য দিকে রয়েছে নিরুত্তরতা । যে দুঃখে তাপে মানুষ মুহ্যমান শেষপর্যন্ত তা অব্যাখ্যেয় হয়ে থেকে যায় । অবশ্য ঐ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল কতকগুলো মানবিক মূল্যবোধ । আজ সেই পরিপ্রেক্ষিত যেখানে অন্তর্হিত সেখানে ট্র্যাজিক জীবনদৃষ্টি অবসিত ।

পক্ষান্তরে কদর্যতা ও অমঙ্গলবোধের প্রবল চাপে পড়ে আজকের শিল্পীরা হয় নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, হয়ে পড়ছেন দেহকেন্দ্রিক, নতুবা প্রবল বিতৃষ্ণায় ধিক্কার দিচ্ছেন । এমন এক ঊষর, ধূসর পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে তাঁরা নিঃসঙ্গতাবোধের পীড়িত । এই অবস্থায় আর যাই হোক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব নয় ।

রবীন্দ্রনাথের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমরা যেসব নাটক পেলাম সবই সমস্যামূলক, মতবাদনির্ভর নাটক, প্রচারধর্মী নাটক, মনস্তাত্ত্বিক নাটক, এমন কি অ্যাবসার্ড নাটকও । কিন্তু ট্র্যাজেডি রচনা আর সম্ভব হচ্ছে না । গ্রীক বা সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির পেছনে যে নিশ্চিন্ত বিশ্ববিধানের অস্তিত্ব ছিল আজ আর তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, বলে অনুরূপ শিল্পকর্ম হল বাধিত । আধুনিক সমালোচক লিখেছেন, "faith in the greatness of man" ট্র্যাজেডি রচনার অপরিহার্য সর্ত । ট্র্যাজেডিকারকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হবার দরকার নেই, কিন্তু মানুষের উপর তাঁকে বিশ্বাস রাখতেই হবে । আধুনিক কালে মানুষের প্রতি অনাস্থা ট্র্যাজেডি রচনার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১। Leech Clifford : Shakespeare's Tragedies : Chatto and Windus 1961 : P. 18.
"No message of hope for the future has been brought. The tragic situation, it is implied, is recurrent in human life, that is why we feel terror, because we have seen men like ourselves yet stronger than we could expect to be, we feel also pride."

২। দাস ডঃ ক্ষুদিরাম : রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় : নূতন প্রথম সংস্করণ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৭ই পৌষ, ১৮৮৮ শকাব্দ : পৃঃ ৩০৭ ।

৩। দত্ত ডঃ ভবতোষ : "রবীন্দ্রনাটকের নায়ক": বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৩ ।

৪। Steiner George : The Death of Tragedy : Faber & Faber(Paper-back) 1974 : p. 291.
"Tragedy speaks not of secular dilemmas which may be resolved by rational innovation, but of the unaltering bias toward inhumanity and destruction in the drift of the world....... There are specific remedies to the disaster which befall the characters and it is Ibsem's purpose to make us see these remedies and bring them about."ইবসেনের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ্য চলে যায় ।

৫। Marx Karl & Engels Frederik : Manifesto of the Communist Party : Foreign Language Publishing House, Moscow, 1948: P.91.
"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing conditions."

৬। Steiner George : The Death of Tragedy : Faber & Faber,paper-back, 1974, P. 127, pp. 323-24 & 342-44.

(প্রাগুক্ত 'প্রস্তাবনা' ~~পাদটীকা~~ উল্লেখ ৬)

৭। Krutch Joseph Wood : The Modern Temper : 1929. x Quotted by Wimsatt W. Jr. and Brooks Cleanth xmXkx in : Literary Criticism, A Short History : Oxford & IBH : xR 1970,p.561.